যুগান্তর

তারিখ ... SEP 1[illegible] 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম [illegible]

প্রফেসর আবদুল মান্নান

কী চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এক অভিনব সংবাদ একাধিক জাতীয় দৈনিকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের সরকারি ও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদপত্রে অনেকটাই নেতিবাচক কারণে শিরোনাম হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদটা কিছুটা ভিন্নধর্মী ও কৌতুকোদ্দীপকও বটে। সংবাদটি নিম্নরূপ : 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা প্রহরীরা বৃহস্পতিবার ১০০টি কুকুর মেরেছেন। নানারকম সুস্বাদু খাবারের ভেতর বিষ দিয়ে কুকুরগুলো মারা হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে পাগলা সন্দেহে এসব কুকুরকে মেরে নিরাপত্তা অফিসের পাশেই সমাহিত করা হয়' (প্রথম আলো, ৮-৯-০৬)। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটুকু জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান অর্জন অথবা বিতরণ সম্ভব হল— তাই সংবাদপত্রে শিরোনাম হবে বলে দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে। শিরোনাম হতে পারে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্রীড়া অনুষ্ঠান অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার খবর কুকুর নিধন আর কুকুর সমাহিতকরণ নিশ্চয়ই নয়। এই ধরনের খবর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। দীর্ঘ প্রায় বত্রিশ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এ ধরনের সংবাদ আমার জন্য একটু বেশি পীড়াদায়ক। এ বিশ্ববিদ্যালয় পেশাগত জীবনে আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। সুতরাং এখানে জন্ম নেয়া যে কোন ভালো সংবাদ আমাকে আনন্দিত করে আর খারাপ সংবাদ বেদনাহত করে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘদিনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো লাগার মতো কোন সংবাদের জন্ম হচ্ছে না।

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক আবুল ফজল উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিসর ছিল ছোট। শিক্ষক শ'দেড়েকের মতো। শিক্ষার্থী হাজার পাঁচেক হবে। তার চেয়ে কমও হতে পারে। শিক্ষক হিসেবে সে সময় যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সারাদেশে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবদুল করিম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক এখলাস উদ্দিন, অধ্যাপক আলমগীর সিরাজ উদ্দিন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, অধ্যাপক রশীদ চৌধুরী, অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান, অধ্যাপক অনুপম সেন প্রমুখ। এদের পাণ্ডিত্য দেশের ভেতর তো বটেই, দেশের বাইরেও ছড়িয়েছিল। এঁদের দু-একজন প্রয়াত। বাকিরা অবসরে গেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্য, এদের মতো পণ্ডিত শিক্ষকদের স্থান পূরণ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী গত চার বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু যে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের হিড়িক পড়েছে তাই নয়; বেশ কিছু ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে খুন-জখম-হত্যা মামলাও আছে। এদের নিয়োগের পেছনে একমাত্র যোগ্যতা ছিল তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং দলীয় আনুগত্য। এমন ঢালাও নিয়োগ আগের কোন প্রশাসনের সময় পরিলক্ষিত হয়নি। যারা এমন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তারা দেশের একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কী পরিমাণ ক্ষতি করেছেন তা উপলব্ধি করার মেধাশক্তি হয়তো তাদের ছিল না।

এক সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ ছিল এর একঝাঁক প্রাণোচ্ছল উদ্যমী তরুণ-তরুণী, যারা গড়ে তুলেছিল অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ঈর্ষার কারণ হতে পারত।

পুরনো প্রশাসনিক ভবনের (বর্তমান মেডিকেল সেন্টার ও আইন বিভাগ) সামনে প্রতি বছর চাকসুর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতো সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। দিনব্যাপী বিভিন্ন হলের কবি, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে চলত নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা। শেষ দিনে হতো ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও নাটক আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এসব খবর দেশের পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হতো। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এসব চলেছিল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে পড়ে এক আত্মঘাতী কোন্দল ও বিভাজনে। ছাত্রলীগ থেকে দুটো প্যানেলে নেতারা নির্বাচন করে। ফলাফল কেন্দ্রীয় সংসদে শোচনীয় হার। সংসদ দখল করে ইসলামী ছাত্রশিবির। বস্তুতপক্ষে সে সময় থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টো পথে যাত্রা। অঘোষিতভাবে ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। গত সরকারের সময় পরিস্থিতি পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ১৯৯৭-২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় মেলা, একুশে মেলা, স্বাধীনতার উৎসবসহ অনেক কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পালন করেছে স্বাধীনতার বর্ণাঢ্য রজতজয়ন্তী। প্রদর্শিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক আর স্বাধীনতাবিরোধীদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোন কর্মসূচি শুধু অভাবনীয় নয়, বিপজ্জনকও বটে। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। যে ছাত্র সংগঠনটি বর্তমানে এই ক্যাম্পাস দখল করে রেখেছে, তারা সেদিন ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ধর্মঘট ডেকেছিল। হুমকি দিয়েছিল অনুষ্ঠান বন্ধ করার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সহায়তা করেছে। সব বাধা চোখরাঙানি উপেক্ষা করে হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক সমাপনী অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রয়োজনে অপশক্তির বিরুদ্ধে তারা একতাবদ্ধ হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না।

> ইদানীং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগজনিত অনেক অবিশ্বাস্য সংবাদ পত্রপত্রিকায় পড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত আমার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, আমরা কি একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে ফেলেছি? যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন শুধু কুকুর নিধনের খবর আসে, সে বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ছিল একটি জমকালো আয়োজন। কয়েকদিন ধরে তা চলত। একেক দিন একেকটি হলের। শেষ দু'দিন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান। দুপুরে খাওয়ার প্যাকেট বিলি-বণ্টন নিয়ে এক-আধটু টেনশন যে মাঝে মধ্যে হতো না, তা নয়। তবে বেলা শেষে সবাই আনন্দ-ফূর্তি করতে করতে বাড়ি ফিরত। সারা বছর খেলার মাঠের অবিচ্ছেদ্য অংশ ইতিহাসের মোকাদ্দেস স্যার। অনুষ্ঠান শেষে বলতেন, ক্রীড়ানুষ্ঠান তো সারা বছর ধরে চলা উচিত। পাঁচ-সাত দিনে কেন শেষ হবে? ১৯৮৮ সালে ক্যাম্পাসে ক্রীড়াকে অনেকটা হারাম ঘোষণা করে একটি ছাত্র সংগঠন। বার্ষিক ক্রীড়ার প্যান্ডেলে অগ্নিসংযোগ করেছিল। রেওয়াজ রক্ষার জন্য আর বাজেটকে হালাল করার জন্য এখন দায়সারা গোছের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয় বটে, তবে তাতে প্রাণের স্পন্দন থাকে না। এই একই ছাত্র সংগঠন একই বছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছিল। কারণ যে ইসলামী চিন্তাবিদ এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন, তিনি তাদের নির্দেশিত ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত এসেছেন। এসেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম আর অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। শহীদ হয়েছেন চাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব। উপমহাদেশের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নামে ছাত্র হলের নামকরণ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় ১৯৮২ সালের ১০ অক্টোবর আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম; যা পরের দিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এই বলে শিরোনাম হয়েছিল— 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে বঙ্গবন্ধুর নামে শোক প্রস্তাব উত্থাপন।' ১৯৮২ সালে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড অনেকটা অচিন্তনীয় ছিল। একই সিনেট সভায় জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম একাত্তরের ঘাতক ফজলুল কাদের চৌধুরীর নামেও শোক প্রস্তাব শুধু উত্থাপন করেননি, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তিনি তার পক্ষে যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সিনেটরদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে তা তিনি প্রত্যাহার করেন। এ সংবাদটিও দেশের সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়েছিল। এসব সংবাদ পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রগতিশীল অংশ গর্বিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিরাজমান পরিস্থিতিতে এসব তথ্য অনেকের কাছে কল্পকাহিনী মনে হতে পারে। তবে হ্যাঁ, এগুলোই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে গর্বিত করার মতো সংবাদ। স্বৈরাচার এরশাদ আমলের প্রথমদিকে সামরিক শাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এদেশে প্রথম রাজপথে মিছিল বের করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। বিদেশ থেকে একজন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এটা কিভাবে সম্ভব? সংবাদটি বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকায় প্রচারিত হয়েছিল।

ইদানীং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগজনিত অনেক অবিশ্বাস্য সংবাদ পত্রপত্রিকায় পড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত আমার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, আমরা কি একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে ফেলেছি? যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন শুধু কুকুর নিধনের খবর আসে, সে বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিষয়টি জানতে আমার এক সাবেক সহকর্মীকে ফোন করলে তিনি খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ক্যাম্পাসে এখনও প্রচুর নেড়িকুত্তা রয়ে গেছে। এগুলোকে না তাড়ালে ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরে আসবে না। সহকর্মীর মন্তব্য একটু চিন্তায় ফেলে দিল।

আবদুল মান্নান : *সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*